BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-I, July 2022
Pp. 07-20

বিশ শতকের নির্বাচিত কবির কবিতায় নারীর নিজস্ব ভাষার বহুমাত্রিকতা

সহেলী সামন্ত

সহেলী সামন্ত
পিএইচডি গবেষক
বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
e-mail: saheli.samanta2016@gmail.com

সারসংক্ষেপ

সমাজে নারীর অবস্থান, তার নিজস্ব জগৎ তৈরি করে, তৈরি করে তার নিজস্ব ভাষা (Women's Dialect)। পুরুষের চোখে নারীর কল্পনা নয়, নিজের ভাষায় নারীর নিজের বক্তব্য তুলে ধরার পর্ব শুরু হয়েছে। সেই ভাষা একটি নতুন পথ নির্মাণ করেছে। এই ভাষায় যেমন নারীর নিজস্ব অভিজ্ঞতা, বঞ্চনার কথা ব্যক্ত হয় তেমন বিচিত্র অভিমুখও চিত্রিত হয়। Laura Mulvey 1975 সালে 'Male Gaze Theory'র কথা বলেন। বাংলা কবিতায় এই Theory ভাঙার পর্ব শুরু হয়ে গিয়েছিল বহু আগেই। এই প্রবন্ধে বিশ শতকের নির্বাচিত চারজন কবি কবিতা সিংহ, নবনীতা দেবসেন, কেতকী কুশারী ডাইসন ও গীতা চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার ভাব ও ভাষা দ্বারা, নারীর নিজস্ব ভাষার বিচিত্র স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। কবিতা সিংহের কবিতার ভাষা তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার, নবনীতা দেবসেনের কবিতাভাষা সংহত, কেতকী কুশারীর কবিতাভাষা আপাত সরল কিন্তু তীব্র অনুভূতিতে ঋদ্ধ, গীতা চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাভাষা সংস্কৃতঘেঁষা প্রজ্ঞা ও মননের দীপ্তিতে উজ্জ্বল। নারীর নিজের ভাষা সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী। বর্তমান প্রবন্ধে নির্বাচিত কবির কবিতাভাষা ও ভাবনার মধ্য দিয়ে নারীভাষার বহুমাত্রিক স্বরূপকে তুলে ধরা হয়েছে।

মূলশব্দ

নারীর নিজস্ব ভাষা, স্বরূপ ও বহুমাত্রিকতা, নির্বাচিত কবির কবিতা

ভূমিকা

বর্তমানে সমাজে প্রচলিত ভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল নারীর ভাষা (Women's Dialect)। নারীর ভাষা তৈরি হয় তার সামাজিক অবস্থান থেকেই। এ জগৎ তার নিজস্ব সম্পদ। নারীর ভাষা তাই আলোচনার দাবী রাখে। সমৃদ্ধ এই ভাষাভাণ্ডারটি বিচিত্র অনুভূতিতে ঋদ্ধ। পিতৃতন্ত্রের নির্ধারিত প্রচলিত পথরেখার বাইরে

বেরিয়ে এই নতুন ভাষাপথটি নির্মিত হয়েছে। এই ভাষার মধ্যেও আবার রয়েছে বিভিন্নতা। নির্বাচিত কবির কবিতার ভাব ও ভাষার মধ্য দিয়ে নারীর নিজস্ব ভাষার ভিন্ন পরিসরকে খুঁজে দেখার প্রচেষ্টা আছে।

পদ্ধতি

প্রবন্ধটি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণাত্মক। এখানে বিশ্লেষণধর্মী ও তুলনামূলক গবেষণা পদ্ধতিকে ব্যবহার করা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্য হিসাবে বিভিন্ন আকর গ্রন্থ ও সহায়ক গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

বিশ্লেষণ

১.

নারী যে ভাষায় তার একান্ত নিজের মনের ভাব নিজের মতো ব্যক্ত করে তাকেই বলা হয় নারীর নিজস্ব-ভাষা। সমাজে নারীর অবস্থান তার স্বতন্ত্র জগৎ নির্মাণ করে। নারীর নিজস্ব এমন কিছু অনুভূতি, জিজ্ঞাসা বা সমস্যা আছে যা পুরুষের থেকে আলাদা। যার প্রতিক্রিয়া পড়ে তার সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক আচরণে এবং তার প্রতিফলন দেখা যায় তার নিজস্ব ভাষায়। *Women's Dialect In Bengali* (1928) বইতে সুকুমার সেন বলেছেন-"Even from the earliest days in the history of mankind, women have a special environment of their own. Men and women have different spheres of occupation. This is true of every country and of every people.....

But though the languages of modern civilized peoples have no sex dialect proper, yet almost all of them preserve some characteristic idioms which are entirely, or almost entirely, confined to womenfolk …..

The origin of the different sex dialects or idioms lies in different psychologies of man and woman."[১]

অর্থাৎ- ক) অতীত ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় নারীর একটি বিশেষ পরিসর ছিল, কর্মক্ষেত্রেও ভিন্নতা ছিল পুরুষের তুলনায়। এটি সব দেশ, কাল ও সময়ের নিরিখে সত্যি। খ) যদিও বর্তমান সময়ে আলাদাভাবে কোনো মহিলা বা পুরুষের লিঙ্গভাষা নেই, কিছু বিশেষ চরিত্র আজও রক্ষিত আছে নারীর কথ্যভাষায়। এবং গ) নারী ও পুরুষের লিঙ্গভাষার তারতম্য হয় মূলত ভিন্নধরনের মানসিকতা থেকে।

এই বইতে তিনি নারীর ভাষার কতগুলি প্রধান চরিত্রের কথাকেও উল্লেখ করেছেন–

ক) নারীর ভাষা পুরুষের ভাষার তুলনায় অনেক বেশি রক্ষণশীল (conservative) এবং প্রাচীন (archaic)।

খ) নারীর ভাষার মধ্যে যতখানি নিন্দার বিষয়বস্তু থাকে ততখানি কিন্তু যথাযথ শব্দ থাকে না, অতিকথন দোষে দুষ্ট হয়। পুরুষের তুলনায় নারীর ভাষা বেশি ভাবপ্রবণ (more emotional)।

গ) নারীর ভাষার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত করেছেন শ্রুতিমাধুর্যকে (Euphemism)। নারীর ভাষার মধ্যে একটা গোপনীয়তা বা লাজুক বৈশিষ্ট্য থাকে যাকে সে তার ভাষায় লালিত করে।

ঘ) নারীর ভাষা কুসংস্কারাচ্ছন্ন (superstitious)। যদিও বর্তমানকালে সেই কুসংস্কার থেকে নারীরা বেরিয়ে আসছেন।

ঙ) পুরুষদের তুলনায় নারীর ভাষার শব্দসংখ্যা সীমিত (limited vocabulary)। পুরুষের ভাষায় অনেক নতুনত্ব আছে কিন্তু নারীর ভাষা প্রাচীনতায় পূর্ণ (Old vocabulary)।

চ) নারীর ভাষায় নিন্দা (Pejorative terms), বিদ্রূপ (smart taunts) এবং উপহাস (saucy ridicule) বেশি গুরুত্ব পায়।

দীর্ঘদিনের গবেষণার পর সুকুমার সেন নারীর ভাষার কতগুলি প্রধান চরিত্রের কথা বললেন, এর থেকে আমাদের নারীর ভাষার স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা তৈরি হচ্ছে। তিনি বলেছেন ভিন্ন লিঙ্গভাষার কারণ হল, ভিন্ন মানসিকতা বা 'different psychology'।

এই ভিন্ন মানসিকতা তৈরি হয় কিভাবে? তার ব্যাখ্যা পাই *Language And Woman's Place* (1975) Robin Tolmach Lakoff এর বইতে - "I think, that women experience linguistic discrimination in two ways, in the way they are taught to use language, and in the way general language use treats them. Both tend, as we shall see, to relegate women to certain subservient functions : that of sex object, or servant ; and therefore certain lexical items mean one thing applied to men, another to women, a difference that can not be predicted except with reference to the different roles the sexes play in society." [২]

ভাষাগত বৈষম্যের দুটি পথ - প্রথমত, নারী তার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী যেভাবে ভাষাকে ব্যবহার করে এবং দ্বিতীয়ত, সমাজে নারী যেভাবে লালিত হয় সেই অবস্থানও ভাষা নিয়ন্ত্রণ করে। তাই নারীর ভাষা প্রসঙ্গে এই দুটি দিকই বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

দুটি ধারণা আমরা পেলাম-একটি বাংলায় নারীদের ভাষা সম্পর্কিত দীর্ঘ গবেষণার ফল এবং অপরটি আমেরিকার নারীদের ভাষার উপর লিঙ্গের প্রভাব বিষয়ক প্রস্তাব থেকে গৃহীত। তবে দুটি ভাবনা থেকে নারীর নিজস্ব ভাষার স্বরূপ জানা গেল। বাংলা কবিতায় নারী ভাষার বিচিত্র রূপ আছে, নারীর নিজস্ব কণ্ঠস্বর বহু আগেই শোনা গিয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর রামী, সপ্তদশ শতাব্দীর চন্দ্রাবতী হয়ে উনিশ শতকে একাধিক মহিলা কবির কথা জানতে পারি - কৃষ্ণকুমারী চট্টোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবীর কথা। এছাড়াও পাই গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী, কামিনী রায়, মানকুমারী বসু, প্রিয়ম্বদা দেবী, কুসুমকুমারী দাশ প্রমুখেরা। গীতিকবিতার যুগ শেষ করে কবিতার যুগে ধীরে ধীরে তার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। বিশ শতকের অন্যতম বিখ্যাত কবি বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকার হাত ধরে আবির্ভাব রাজলক্ষ্মী দেবীর। এতদিনের প্রচলিত পুরুষ নির্মিত ভাষা, ভাব, আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুকে বাদ দিয়ে নিজস্ব ভাষা নির্মাণ পর্ব শুরু হল। এর বহুবছর পরে ১৯৭৫ সালে ব্রিটিশ নারীবাদী সিনেমা তাত্ত্বিক Laura Malvey তাঁর *Visual Pleasure And Narrative Cinema* বইতে 'Male gaze' কথাটিকে ব্যবহার করেছেন। যেখানে তিনি লিঙ্গগত বৈষম্য বিষয়ক দুটি পৃথক শ্রেণির কথা বলেন- 'Active Male' এবং

'Passive Female'। নারীকে নিষ্ক্রিয়, পুরুষের কল্পনার বিষয় হিসাবেই এতদিন ভাবা হত। এই 'Male gaze' ভাঙার পথ তৈরি হয়ে যায় বহু আগে থেকেই। নারী তার নিজস্ব ভাবনায় নিজস্ব ভাষাকে সমৃদ্ধ করে। পূর্ববর্তী মহিলা কবিদের কলমে উঠে এসেছিল অন্তঃপুর জীবনের রুদ্ধশ্বাস, শোকগাথা, আনন্দ, বিষাদ ও প্রেমানুভূতির সহজ স্বীকারোক্তি। রাজলক্ষ্মী দেবী প্রথম বাংলা কবিতায় সেই নারীর স্বকীয় ভাষার নির্মাতা, যার পূর্ণপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল কবিতা সিংহের হাতে। তারপর ধীরে ধীরে একাধিক কবির কলমে এই ভাষা ভিন্নমাত্রা লাভ করছে, এই ভাষা নতুন ও বর্ণময়।

২.

ক) কবিতা সিংহের কবিতা

বিশ শতকের পাঁচের দশকের একজন অন্যতম কবি কবিতা সিংহ। তাঁর কবিতার কেন্দ্রবিন্দু, নারী। যিনি কবিতা শুরু করলেন 'না' দিয়ে–

> "না, আমি হব না মোম
> আমাকে জ্বালিয়ে ঘরে তুমি লিখবে না।
> হবো না শিমুল শস্য সোনালী নরম
> বালিশের কবোষ্ণ গরম।" [৩]

এতদিন নারী ছিল কবির কল্পনার বিষয় বা subject, সেই নারী আজ নিজে কথা বলছে, প্রত্যাখ্যান করছে প্রচলিত কাঠামোটিকে। সে নিজে তার সৃজনী সত্তাকে আশ্রয় করে চেনাপথ থেকে বেরিয়ে এসে নিজস্ব পথ নির্মাণ করছে।

সদ্য পরাধীনতা থেকে মুক্তি পাওয়া ভারতবর্ষ, বিপর্যস্ত জনজীবনের সত্তার গভীরে যখন চলছিল আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই, স্বাধীনচেতা নারীরা তখন ঘরের চৌহদ্দি থেকে পা রাখছে কাজের জগতে, আর্থিক সংকট যার অন্যতম কারণ। এমন সময় বাংলা কবিতায় মূর্ত বিদ্রোহিনী কবিতা সিংহের আবির্ভাব।

'না', কেবল একটি উচ্চারণ নয়, প্রতিবাদ, ফিরে দাঁড়ানোর ধ্বনি। সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছে পরবর্তীকালের একাধিক কবির কবিতায়। আসলে এই প্রত্যাখ্যানের সুর ভিন্নমাত্রায়, ভিন্নসুরে ভিন্ন কবির মানসলোকের অন্তর্গত ফসল হয়ে চিত্রিত হয়েছে। কবিতা সিংহের নিজের কবিতাতেই 'না' ভিন্নমাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছে। কয়েক প্রজন্ম বাহিত বঞ্চনার নির্যাস, সমাজে নারীর অবস্থানগত বৈষম্য, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, সাম্য সমাজের প্রত্যাশা, বোধের সর্বোচ্চ মাত্রাকে স্পর্শ করেছে তাঁর কবিতা।

কবিতা সিংহের চিত্রিত নারীসত্তাটি ঠিক কেমন?

> "অজস্র ছুরিকাঘাত তবু সে রানির মতো স্থির
> দুহাত বুকেতে চিকে, রক্ত ধারা হাজারো ফিনিক
> গুপ্তঘাতকের মুখ, বিষাক্ত আকর্ণ টান তীর
> তবু তার পিঠ নয়, সারা বুক বিদ্ধ করে দিক।"[৪]

যখন কবিতা সিংহ লিখছেন, তখনও পর্যন্ত মহিলার কবিতা লেখা ভালো চোখে দেখা হত না বা গ্রহণযোগ্যতাতেও বহু সমস্যা ছিল। ঈর্ষা, নিন্দা, সমালোচনা সবকিছুই দেখতে হয়েছে, তবুও থেমে থাকেননি, চোখে চোখ রেখে সাহসের সঙ্গে কথা বলে গেছেন। নারীর দুঃখ, বঞ্চনার ইতিহাসকে সোচ্চারে কবিতায় প্রকাশ করেছেন। চেনা পৃথিবীর গণ্ডী ছাড়িয়ে নারী ধীরে ধীরে 'সব হিসেবের বাইরে' চলে যায়–

"জ্বলন্ত রমণী যায় নাগালের, শুশ্রূষার সম্পূর্ণ বাহিরে।

বুকের উপরে তার রক্ত শোষে ঐতিহ্যের জোঁক
অকালে নিহত তার মাতাময়ী রোগ রেখে গেছে
ক্রুদ্ধ রক্তচাপ ওঠে, অগ্নি বমন ওঠে, রক্তকণা বাহিত ফোয়ারা
বুকের তলায় তার মাথা কোটে জননীর বহ্নি কর্কট,
সেই দুঃখ, সেই রোগ, সেই নীল অঘোর-বঞ্চনা
সংসার সমাজ থেকে নিয়ে যায় খসায়ে তাহাকে

অনলবর্ষিণী যায়, তীব্র অশ্বে শুশ্রূষার, নাগালের, সম্পূর্ণ বাহিরে।"[৫]

কবিতা সিংহের কবিতার ভাষা এমনই ধারালো। অকালে মৃত পূর্বনারীরা তাঁর রক্তে আলোড়ন তোলে, তাঁর কবিতার ভাষাকে শানিত করে। শুধু পরিবার নয় সমাজেও এমন অগাধ উদাহরণ ছিল, যার উত্তর খুঁজতে চেয়েছেন কবি। ক্রমাগত 'অদ্ভুত হীনতা' থেকে 'চরিত্রের দিকে' উপনীত হচ্ছে তাঁর নারীসত্তাটি। আত্মনির্মাণের পর্বে পৌঁছে গেছে সে, এই যাত্রাপথের Transformation বা রূপান্তরটিকে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন–

"কার সঙ্গে কথা বলো? আমি ত কবেই চলে গেছি!
যে ভাবে নারীরা যায় শব্দহীন চালচিত্র ছিঁড়ে
দেহ থেকে খসায়ে শিঞ্জিনী, ধ্বনিমায়া
হাট করে চলে যায় ভ্রূমধ্য টিপের লাল খিড়কি দরোজা
যে ভাবে নারীরা যায় অদ্ভুত হীনতা থেকে চরিত্রের দিকে।

সঙ্গবিহীন একা, নিজের আঁতুড়ে
আপন মৃত্তিকা ছেনে নিজের নির্মাণে।" [৬]

কবিতা সিংহের কবিতাভাষার তীব্রতা লক্ষ করি বেশ কয়েকটি কবিতায়– 'স্বয়ংক্রিয়' কবিতায় ১৯৬৬ সালের কুমারী মালতী মিত্রের সেকেন্ড হ্যান্ড 'পুরুষ বিকল্প' বা 'বিকল্প পুরুষ' কেনার কথা বলেছেন–

"একশো চুম্বন পাবে এই লাল স্যুইচ জ্বালালে
চারশত তোষামোদ কবিতার উদ্ধৃতি সমেত
আলিঙ্গন / যৌনক্রিয়া / মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকা
খয়ের গোলাপী নীল
এই সব বিবিধ বোতামে।"[৭]

পুরুষের ব্যবহারে অতিষ্ট নারী 'বিকল্প পুরুষ' এর কথা ভাবছে। মানুষ নয়, যন্ত্রের কাছে ভরসা রাখছে সে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রটি নারীর প্রত্যাশিত সমস্ত আবদার পূরণ করে দেবে। ১৯৬৬ সালে দাঁড়িয়ে এমনভাবে কবিতার ভাষা উচ্চারণ করতে পারেন কবিতা সিংহ। কিংবা, 'এস্‌টাব্লিশমেন্ট' কবিতায় anti-establishment বিষয়কে প্রতিষ্ঠা করেছেন–

"তখন নিজেকে এক সম্রাজ্ঞীর মতো মনে করে
মনে হয়, তোমাকে নিক্ষেপ করি দাসীদের আহ্লাদী সভায়!
কিম্ভূত রগড় দেখি।" [৮]

পুরুষকে দাসীসভায় নিক্ষেপ করার চিন্তা দ্বারা এভাবে বিপরীত ভাবনার তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে পিতৃতন্ত্রকে (Patriarchy) সজোরে আঘাত করেছেন।

খ) নবনীতা দেবসেনের কবিতা

বিশ শতকের পাঁচের দশকের অন্যতম কবি নবনীতা দেবসেন। তাঁর কবিতা ভাষায় একটা স্বাভাবিকতা আছে। সেই স্বাভাবিকতার মধ্যেও তিনি স্পষ্টভাষায় নারী-পুরুষের প্রকৃত অবস্থানের কথাকে ব্যক্ত করেছেন। প্রেম ও প্রেমহীনতার বেদনা ভিন্নভাবে কবিতা হয়ে এসেছে। ১৯৬৪ সালের ৯ মে লিখছেন 'ছুটি' কবিতাটি। যে নারীসত্তাটি তার সর্বস্ব দেয় প্রেমের জন্য, তার প্রাপ্তি কি থাকে? ছুটি বা প্রত্যাখ্যান। প্রেমে উন্মুখ সত্তাটি যখন প্রিয় মানুষের অন্তর থেকে ছুটি পায় তখনও কোনো তীক্ষ্ণ বাক্যমালা নেই, অন্তর্গত বেদনায়, অভিমানে পরিস্ফুট। নবনীতা দেবসেনের কবিতায় বেদনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সংযত শব্দমালায়। 'পুষ্পিত প্রহার' কবিতায় বলেছেন–

"তুমি মেরেছিলে ব'লে আজ আমার ফুলন্ত বাগান।
প্রতিটি আঘাত কাঁপে কণ্টকিত কেতকীর ঝাড়ে
গোলোক চাঁপায় ঝরে সকালের অশ্রুজল যত
শোণিতাক্ত কৃষ্ণচূড়া জ্ব'লে ওঠে বসন্তবাহারে।

কোনোখানে লেখা নেই সেদিনের বিস্মৃত বানান
সমস্ত বেদনা এক পুষ্পময় প্রহারে সংহত।" [৯]

তাঁর কাছে 'সমস্ত বাস্তব / একটি তরঙ্গতৃপ্ত সমুদ্রের স্তব'। অন্তর্গত একাকী সত্তার প্রকাশেও একটা আড়াল রাখছেন। নিজের জীবনের দুঃখকথাকে একেবারে উদোম করেননি।

'দিগ্বিজয়ের রূপকথা' কবিতায় কবি 'আশীর্বাদ দুটি সরঞ্জাম' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন– 'বিশ্বাস' ও 'ভালোবাসা' কে। তবে তাঁর শেষপর্বের কবিতাগুলোতে আছে একাধিক নারীসত্তা। 'ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নম্' কবিতায় কুন্তীর প্রত্যাশার মধ্যে নিহিত আছে প্রতিবাদ। যে কুন্তী একদিন লোকলজ্জার ভয়ে সন্তান বিসর্জন দিয়েছিল। আজ আর সে ভয় পায় না, বরং পুত্র কামনা করে সূর্যদেবের কাছে। নবনীতা দেবসেনের নারীসত্তাটিও ঠিক আজকের কুন্তীর মতোই পরিণত। কিংবা ১৯৭১ সালে 'স্বামীর জন্য টাট্‌কা স্যালাড' কবিতাটি শ্রীমতী জারমেইন গ্রীয়রকে

উদ্দেশ্য করে লেখা। এখানেও আছে তীব্র শ্লেষ। পল দু ফেউ কে বিষমুক্ত করে সতেজ জীবনীশক্তি দিয়ে বাঁচিয়ে ১৯৬৮ সালে বিয়ে করলেও, স্থায়ী হয়নি বিয়ে, মাত্র তিন সপ্তাহ টিকে ছিল। বিশ্বাসভঙ্গই একমাত্র প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু গ্রীয়র থামলেন না ১৯৭০ সালে জন্ম নিল তাঁর বিখ্যাত বই- *The Female Unuch* যা সারা পৃথিবীতে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। ভালোবাসার আর এক আয়না তুলে ধরেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসের কুসুম এর কথা দিয়ে, বা 'পুতনার প্রতি' কবিতায়ও উঠে আসে তাঁর প্রতিবাদী অক্ষরমালা। পুতনা কংসের ভাড়াটে দানবী, যার দ্বারা শিশুকৃষ্ণকে হত্যার পরিকল্পনা ছিল। যে তার বিষদুগ্ধ দ্বারা কৃষ্ণকে হত্যা করতে পারেনি বরং নিজের প্রাণ দিল। পুতনা 'Evil Spirit' এর মিথ হল। কবির প্রশ্ন শিশুকৃষ্ণের বিষমাখা দাঁত তো কম দায়ী নয়। নশ্বরী দানবী পুতনারা ব্যবহৃত হয়ে প্রাণ দেয় আর শিশুকৃষ্ণ বিষমাখা দাঁতেও 'মৃত্যুহীন দেবতা' রূপে পূজিত হয়। তাহলে সমাজে পুতনাদের প্রকৃত অবস্থান ঠিক কোথায়?

২০০১ সালে লেখা 'নাজমা', তাঁর অন্যতম একটি বিখ্যাত কবিতা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সদ্যস্বামীহারা নাজমার দেহে আগামীর ভ্রূণ। দলাপাকানো মাংসপিণ্ড হয়ে স্বামী যখন ফিরে আসে তখনও সরস্বতী বোনরা স্বপ্ন দেখায়–

"নাজমা, তোমার নির্জলা চোখ, জানি-
কিন্তু এবার বুক ভেসে যাক দুধে
নতুন মানুষ আসছে তোমার কোলে

আমরা ওকে অন্য জগৎ দেব" [১০]

নাজমারা হয়তো এই 'অন্য জগৎ' এর প্রত্যাশায় পুনরায় বাঁচার স্বপ্ন দেখে।

একটি 'ধর্ষণরাত্রির স্মৃতি'কে সামনে রেখে নারী ও পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গির আকাশপাতাল তফাৎকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতেও ছাড়েন না নবনীতা দেবসেন–

"পুরুষ : ওইদিন সন্ধ্যারাতে কোকিলের স্বর
নারী : ওইদিন চন্দ্রহীন রাত্রি দ্বিপ্রহর

পুরুষ : শাল পিয়ালের বনে পরী নেমেছিলো
নারী : সুন্দরীকাঠের বনে ব্যাঘ্র এসেছিলো

পুরুষ : জ্যোৎস্নামাখা বসন্ত বাতাসে
নারী : রক্তাক্ত উচ্ছিষ্ট পড়ে আছে।।" [১১]

যে রাতটি পুরুষটির কাছে বসন্তের বাতাসমাখা সুন্দর আবহ, নারীটির কাছে সেই রাত এক অভিশপ্ত অমাবস্যা হয়ে আসে। কবি নবনীতা এইভাবে দ্বৈত ভাবনার অন্তর্গত বুনোটে চিত্রিত করে দেন পুরুষ ও নারীর প্রকৃত অবস্থানটিকে। তাঁর কবিতার শব্দমালা যথেষ্ট শক্তিশালী। আপাত স্নিগ্ধতার মোড়কে অনুভবের প্রগাঢ় কথামালা অনন্ত স্ফুলিঙ্গে সমান্বিত হয়ে আছে।

গ) কেতকী কুশারী ডাইসনের কবিতা

বিশ শতকের ছয়ের দশক থেকে কেতকী কুশারী ডাইসনের লেখা কলকাতার পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করলেও পড়াশোনা করেন অক্সফোর্ডে এবং বিবাহসূত্রে তিনি ইংল্যান্ডের বাসিন্দা। তবে বাংলা ও ইংরেজিতে লেখেন। তাঁর কবিতা বাংলা কবিতার জগতে একটি ভিন্ন মাত্রা আনে। তাঁর কবিতায় আমরা পাই প্রকৃতি ও বৃক্ষের প্রতি তীব্র সহানুভূতির প্রগাঢ় স্পন্দন, বিশ্ববন্দিত নানান বার্তা, নারীসত্তার বিচিত্র কারুকাজ - তিনি ধিক্কার জানান, ব্যঙ্গ করেন, প্রশ্নবাণ ছুঁড়ে দেন, কোথাও বিব্রত হন, অনুপ্রেরণা পান। তবে তাঁর কবিতার নারী বিশ্বখ্যাতির আসনে অবস্থিত। ভাষার সারল্যে, অনুভূতির সুগভীর অনুরণনে তাঁর কবিতাগুলি চিত্রিত হয়েছে। আবার কবিতার ভাষায় উঠে আসে বিভিন্ন ভাবনা - ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে প্রয়াসী আবার কোথাও আছে পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতা। কোনো কবিতায় আছে শৈশবের মেহেরপুরের স্মৃতি, শিকড়ের টান খোদিত হয় কবিতার অক্ষরমালায়। 'পিছুটান' কবিতায় বলেন–

> "আজ মনে পড়ে
> শীর্ণা ভৈরবীর তীরে ছোট মহকুমা, ছোট বাড়িখানি।
> দেওয়াল সিমেন্ট-ওঠা, কোথাও মলিন।
> ভোরের শিশিরে ভেজা নরম সবুজ মাঠে দোপাটির ঝরা পাপড়ি,
> রাশি রাশি কাঠমল্লিকা,
> লাল লঙ্কার চারা চিকণ পাতার ভারে ঢাকা।" [১২]

সেই স্মৃতি যখন প্রবল হয় তখন অন্তর্গত অনুভবের সংবেদন দ্বারা তিনি দেশকে দেখেন। তাঁর কবিতায় নারীসত্তা কখনও নালন্দার আরোগ্যভবনের প্রাচীরের নীচে থাকা নিঃস্ব জনপদ থেকে উঠে এসেছে। 'নালন্দার পথে' কবিতায় আছে সেই অস্থিসার, অবগুণ্ঠনবতী নারী - যে ছোট একটি পুষ্করিণীর প্রান্তে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে অনেক ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে, তার চোখদুটি কোটর নির্গত এবং সাদা নিশ্চল পাথরের মতো। এই মুখটি কবিকে তাড়িত করে, তিনি বলেন–

> "..... অন্ত্রের অভ্যন্তরটা কিরকম ঘুলিয়ে
> ওঠে, আর গৌতমের গৃহত্যাগ স্মরণে আসে। যখনই এ পথে যাই, ভাবি,
> এখন বোধ হয় সে থাকবে না; কিন্তু প্রত্যেকবারই তাকে দেখা গেছে।" [১৩]

দূর-দূরান্তর থেকে জ্ঞানার্থীরা আসেন নালন্দায় জ্ঞানলাভ করার জন্য কিন্তু কবি বলেছেন 'আমার অন্তঃসলিল চৈতন্যের সহস্র সংশয় ও জিজ্ঞাসা' নির্বান্ধব ঐ মানবীটির বিপন্ন অস্তিত্বের দিকে ছুটে যায়। গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক। বৌদ্ধরা তাঁকে দিব্য শিক্ষক মনে করেন, যিনি নিজের অন্তর্দৃষ্টির কথা সকলকে জানিয়ে চেতন সত্তার পুনর্জন্ম ও দুঃখের সমাপ্তি ঘটাতে সাহায্য করেছেন। কবি যখন নালন্দার পথে ঐ অসহায় নারীকে দেখেন তখন তাঁর মনে হয়, গৌতম বুদ্ধ যা বোঝাতে চেয়েছিলেন তা স্বচ্ছ ক'রে বুঝিয়ে যেতে পারেন নি - 'কিছু আবিল জলরাশি রয়ে গেছে।' ঐ নারীটির তো দুঃখের সমাপ্তি হয় নি। এইভাবে কবি কেতকী, নিজের অন্তর্দৃষ্টির ছোঁয়ায় বাস্তব থেকে তুলে আনেন ভাবনার বিষয়। নিজস্ব মনন ও প্রজ্ঞার দীপ্তিতে যা আলোকিত হয় কবিতা রূপে।

১৯৮০ সালে 'সবীজ পৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'ঘর' কবিতাটি লেখেন তিনি। দুর্গাপুরের গান্ধীমোড়ে পর-পর দু-দিন এক যুবতী ভিখারিনিকে দেখেছিলেন, যে বিড়ি খেতে খেতে গভীরভাবে কোনো বিষয় ভাবছিল। সেই চাহনি কবি কেতকীকে ভাবায়, কোনো প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করায়। তিনি বলেন–

"আচ্ছা, আমার কি কোনো কালে কোনো ঘর ছিলো
সদরে বা অন্দরে ?"[১৪]

একটি দৃশ্য, এতো বড়ো একটা প্রশ্ন তৈরি করে। এই লেখার প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে Adeline Verginia Woolf একজন ইংরেজ লেখিকা তাঁর *A Room Of One's Own* লিখেছিলেন (১৯২৯)। কবিতা সিংহ ১৯৭৭, ১৯ ফেব্রুয়ারি 'দেশ' পত্রিকায় লিখেছেন 'আমাদের ঘর চাই'। সত্যিই নারীর নিজের ঘর কি আছে কোথাও? এই গভীর জিজ্ঞাসা আছে। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ এক সভায় সোচ্চারে ঘোষণা করেছিলেন সৃজনশীল নারীর নিজস্ব ঘর প্রয়োজন। কবিতা সিংহ তীব্র বাক্যবাণে একাধিক কারণ দেখিয়ে বললেন 'আমাদের ঘর চাই'। আর কেতকী এক তরুণী যুবতী ভিখারিনির চোখ দিয়ে সমাজের দিকে তাকালেন এবং পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন নারীর নিজস্ব কোনো ঘর কোনো কালেই ছিল না।

কিংবা পাউডারের টিনের বাক্সে একটি মেয়ের মুখ তাঁকে বিব্রত করে। বিজ্ঞাপিত নারীদেহ সম্পর্কে যে ধারণা আছে সেই ধারণাটিকে সজোরে ধাক্কা দিলেন। যে মেয়েটির মুখ এখানে দেখানো হল সে তার সর্বস্ব দেয় নি, সেও খোলা চোখে এই পৃথিবীটাকে দেখছে। প্রয়োজনবোধে সে নিজেকে প্রকাশ করছে। এই জায়গায় কবি কেতকীর মোক্ষম জবাব আছে। কেবল মেয়েটি object নয়, সস্তার 'spice girl' নয়, বিপণনের সামগ্রী নয়, তারও মস্তিষ্ক আছে সেও পৃথিবীকে দেখে। কবি কেতকীর কবিতা লেখার এটি একটি বিশেষ রীতি। কোনো একটি সাধারণ বিষয়বস্তুকে নিজের প্রজ্ঞার স্পর্শে সোনা করে তোলেন, একটি Text তৈরি করেন। 'একটি খবর প'ড়ে' কবিতায় বাংলাদেশের বন্যায় ভেসে আসা একটি কিশোরীর মৃতদেহকে দেখে, তার সঙ্গে নিজের ভাবনাকে সমান্বিত করে নারীর অবস্থানকে চিত্রিত করেন। বেঁচে থেকে যে নারীর নিজের কোনো ঘর থাকে না, মৃত্যুর পরেও সে মাটি পেল না। কবি বলেন–

"পাণ্ডুর তোমার মুখটি, অকলঙ্ক -
নালফুল,
ছিন্নমূল, ভেলাসর্বস্ব,
অজাত বিশ্বের
ভ্রূণ, ভ্রাম্যমাণ,
অস্তিত্বের অন্বেষণে
সহোদরা।"[১৫]

এই কিশোরীটি যেমন ছিন্নমূল, তার পায়ের নীচের মাটি নেই সে আজ অস্তিত্বের সংকটে আছে। ঠিক কবিও নিজের সত্তাকে সমান্বিত করে বিদেশের মাটিতে থেকে একই রকম নিজের অস্তিত্বের অন্বেষণ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাই 'সহোদরা' বলেছেন মেয়েটিকে। এ তো নারীসত্তার প্রকৃত অস্তিত্বের প্রশ্নকেও তোলে। সমাজে নারীর

প্রকৃত অবস্থান কোথায়? কোথায় তার 'মাটি'? সেও তো 'ছিন্নমূল', 'ভ্রাম্যমাণ', 'অজাত বিশ্বের ভ্রূণ' ধারণকারী, 'নালফুলে'র মতো। যে সত্তাটি শিকড়ের টানে মাটি খোঁজে প্রতিনিয়ত। এভাবে চেতনার গভীরে নাড়া দেয় কেতকীর কবিতার ভাষা। বাইবেলের প্রথম মানব-মানবী আদম-ইভের কাহিনির নতুন ব্যাখ্যা করলেন কবি কেতকী–

"অদৃষ্টের নব আদম,
বিস্মৃত সুকৃতের সাধন,
চুরমার পানপাত্র
জোড়া-দেওয়া তিল তিল ক'রে;
আজও তার হাতে আমার
দেওয়া হয়নি সে-আপেল
যা লাল হয় আমার জঙ্গলে
আর ঝ'রে পড়ে।"[১৬]

বাইবেলে পৃথিবীর প্রথম মানব-মানবী আদম ইভের কথা আছে। জ্ঞানবৃক্ষের ফল আপেলের রূপকে যৌনতার স্পর্শে আদম ও ইভের স্বর্গচ্যুত হয়ে দুঃখময় মানবজীবন লাভ করার কাহিনি আমরা জানি। আদম ঈশ্বরের প্রথম সৃষ্টি। ইভ, আদমের পাঁজর থেকে তৈরি, দ্বিতীয় নির্মাণ। ইভের যৌন কামনায় এই পতন। এই কাহিনির নব নির্মাণ করলেন কবি কেতকী, তিনি তাঁর ইভকে দিয়ে সেই ভুল করালেন না। ইভের যৌনআকর্ষণকে বাঁচিয়ে রাখলেন। ইভের কান্না বেঁচে থাকে আজীবন। তাঁর ইভ যৌনতার সুখ আদমের কাছ থেকে প্রত্যাশা করে না। আর স্বর্গকে অপবিত্র করার ভয় নেই। একলা ইভ বাঁচতে পারে। কেতকী আলোকপাত করেন অন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকেও। ভারতবর্ষের নিজস্ব ঐতিহ্য তাঁতের শাড়ি। নিজস্ব গৌরবকে ভুলে বিদেশী বহুমূল্য বস্ত্রে মজে থাকা ভারতের কথা বলেন 'ফিরিঙ্গি বণিকদের প্রেতাত্মাদের জবানবন্দি' কবিতায়। তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে আরও ভয়ংকর সমস্যার চিত্র। সমুদ্রের জলে তেলের ভয়ানক প্রভাব, কবিতার নাম 'বার্তা'। এই কবিতার মধ্য দিয়ে কবি কেতকীর পরিবেশের প্রতিও সংবেদী চিত্তের প্রতিভাস ফুটে ওঠে।

ঘ) গীতা চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা

বিশ শতকের সাতের দশকের উল্লেখযোগ্য কবি গীতা চট্টোপাধ্যায়। প্রচারবিমুখ মানুষটির কবিসত্তা সত্যিই বিরল প্রতিভামুখী। তিনি নিজের 'কবিতাসংগ্রহ' এর 'ভূর্জপত্রে' কবিতা সম্পর্কে বলেছেন– "আমার কাছে কিন্তু কবিতাই গোবিন্দ গোবিন্দই কবিতা। ভগবদ্ গীতার ভাষায় 'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং / মন্যতে নাধিকং ততঃ'। যা পেলে আর কিছুই পাবার নেই আমার কাছে তা কবিতা।"[১৭]

১৯৭৫ সালের ২৮ এপ্রিল তারিখে লিখেছেন 'মনসার সর্পসজ্জা' কবিতাটি। যেখানে মনসার সর্পসাজের সঙ্গে কবিতার স্বরূপের মিল খোঁজেন। মনসা কশ্যপ মুনির মানসজাত, স্বয়ম্ভু, শিবদুহিতা, জরৎকারুর পত্নী, আস্তিকের মাতা। তার কণ্ঠমূলে সাপের সুতলি, শ্বেতনাগ পাহারা দেয়, কপালে অনন্তনাগের মুকুট, বেতনাগ নাভি বেষ্টন করে আছে, পায়ে মকরনাগ, মেরুদণ্ডে হেমন্তনাগ ইত্যাদি। দেবী মনসা বিষহরণ করে তাঁর অমৃতনেত্রে জগৎ কল্যাণ করেন। নিজস্ব গোপনকথা, দুঃখ, কষ্ট, লজ্জাগুলোই তো কবির অন্তর্লোকের জাদুকাঠির ছোঁয়ায়

মানসজাত গরলমুক্ত হয়ে আন্তরিক শুভবোধের উৎস, কবিতা হয়ে ওঠে। এই সর্পগুলি আসলে কেবল মনসার সাজ নয়, অন্তর্লোক বিশুদ্ধিকরণও ঘটে এদের দ্বারা। শব্দ থেকে রূপকল্প, সংকেত, ইমেজ, বোধের চারুতায় কবিতার জন্ম। মনসার সাজ শিল্পময় ও গুরুত্বপূর্ণ, কবিতাও শিল্প সমৃদ্ধ।

"দর্পণে নিজস্ব কথা, লজ্জা শঙ্কা গোপনতা, গরল উজাড় করে স্নেহে
হেসে ওঠে মনসার মতো শিল্পকারুকৃতি সেই সর্পভরণা কবিতা -
বিষনয়নের তীর যার বুকে বেঁধে, শব্দ-জর্জরিত সে-নষ্ট কবিকে,
বাঁচায় অমৃত-নেত্রে বিষতন্ত্রময়ী দেবী সর্বাত্মিকা প্রসারিণী দেহে।"[১৮]

কবিসত্তা কখনও বিপাশা নদীর তীরের গায়ক হয়ে নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় খোঁজেন সেই নারী সত্তাকে। এই গায়ক 'বিস্মিত কুমারী', 'স্বতন্ত্র কুমারী', 'নিঃশব্দ কুমারী সত্তার প্রয়াসী। সন্ধ্যাই কুমারীর বেশে 'সন্ধ্যার সংগীত' রচনা করে যায়। প্রকৃতি ও নারী যেন এক অভিন্ন সত্তা। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেয় জাতিসংঘ। এরপর থেকে সারা পৃথিবীতে এই দিনটি পালিত হয় নারীর সমঅধিকার আদায়ের প্রত্যয়কে ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে। সারা বিশ্ব যখন ১৯৭৫ সালটিকে সাড়ম্বরে পালন করছে, সেই বছরই কবি গীতা চট্টোপাধ্যায় লেখেন 'ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ' এর মতো কবিতা। তাঁর কবিতার নারী দিনের শেষে ভরাকলসি জল নিয়ে পা পিছলে পড়ে গিয়ে রক্তাক্ত হলেও সেই চিহ্নকে গোপন করে আত্মঅনুরাগে, তার চোখে তখনও নতুন আলোক লাগেনি। সে তখনও 'পুরানো বাংলার মেয়ে' যার 'একদিন ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ'। কিংবা 'কর্তার ঘোড়া দেখে রাসসুন্দরী' কবিতায় উঠোনে কর্তার মহিমময় ঘোড়ার সামনে আসার সাহসটুকুও সঞ্চিত হয়নি তাঁর–

"নষ্ট মধ্যাহ্নের বেলা রাশি রাশি ধানে যায় ভেসে
কর্তার প্রতিভূ ঘোড়া আঙিনার দুয়ার আটকিয়ে
দাঁড়িয়েছে সব ঢেকে তেরোশো পাঁচের বাংলাদেশে।"[১৯]

রাসসুন্দরী দেবী প্রথম মহিলা যিনি আত্মজীবনী লেখেন 'আমার জীবন' নামে। বিশ্বের দরবারে নারীর অগ্রগতি হলেও বাংলার নারীর অবস্থানের খুব একটা অগ্রগতি হয়নি, তখনও পুরুষতন্ত্রের শক্তি তার দুয়ার আটকে দাঁড়িয়ে আছে, তার থেকে তখনও সে বেরিয়ে আসতে পারেনি।

একটি অগ্রন্থিত কবিতা 'লিব্ আন্দোলনের বিপক্ষে ঈশ্বরের পদপ্রান্তে' কবিতায় পাই কবির মূল্যবান মন্তব্য। The Women's Liberation Movement (WLM) কেই লিব্ আন্দোলন বলা হয়, যা Radical Feminism এর অন্তর্গত, ১৯৬০ - ১৯৮০ পর্যন্ত চলেছিল। রাজনীতি, বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নারীর সমমর্যাদার দাবীতে সোচ্চার হয়ে লিব্ আন্দোলনের জন্ম হয়। গীতা চট্টোপাধ্যায় ১১.১১.১৯৭১ সালে লিব্ আন্দোলনের বিপক্ষে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন জানান–

"নিজেকে কী তুমি ভাবো, নতজানু যখন পুরুষ
পদপ্রান্তে আত্মহারা এনে রাখতে চেয়েছে চুম্বন ?

তখন কি মহীয়সী দেবীর মতন আলৌকিক
চালচিত্রে বন্দী হলে মূর্তমহিমার আলম্বন ?

তখন কি করুণার দানপাত্র হাতে ধীরস্থির
অভিনয় করে গেছ দয়াবতী প্রাচীন রাজ্ঞীর ?"[২০]

আসলে কবি সমান মর্যাদার প্রত্যাশী। তাই 'নতজানু পুরুষ' বা 'অদ্বিতীয় ঈশ্বরের মতো অহংকারী ' নারীসত্তার ও বিপক্ষে। নারী-পুরুষের পাশাপাশি অবস্থান ও যুগলবন্দিতেই সুন্দর সমাজের জন্ম - এই তাঁর গভীর প্রত্যাশা। জীবনের শেষ দিকের কবিতাগুলিতে আবার কবির সুরে খানিকটা বদল এসেছে। 'মনুসংহিতা'র ২/২১৩ শ্লোকটিতে আছে– 'স্বভাব এষ নারীণাং নরাণামিহ দূষণম্' অর্থাৎ 'ইহলোকে পুরুষকে দূষিত করাই নারীর স্বভাব'। চাঁদ অনেক কলঙ্ক মেখেও অপূর্ব নেশা লাগায়, কস্তুরী অপূর্ব গন্ধ দেয়। নারীকে দোষারোপ করে দূরে সরালে পড়ে থাকে 'শুধু এক বিষাদ বিজন' 'বুকভর্তি পরবাস'। নারী তার আপন স্বভাবে অপূর্ণতাকে পূর্ণতায় ভরে দেয়। কবি এই শ্লোকটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এক পূর্ণতার দৃষ্টিতে। নারীর পিতৃতন্ত্র নির্দিষ্ট এই আপাত অপূর্ণতার পরেও তার প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা আছে। আবার 'মনসামঙ্গল' কাব্যের কাহিনিকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন 'বেহুলা জোয়ার' কবিতায়। কালনাগিনীর বিষে চাঁদ সদাগরের পুত্র এবং বেহুলার স্বামী লখিন্দরের মৃত্যু হয়েছে সাঁতালি পর্বতে। লখিন্দরের মৃতদেহকে কলার মান্দাসে নিয়ে ভেসে যায় বেহুলা, দেবতাদের মুগ্ধ করে প্রাণ ফিরে পায় স্বামীর। মনসামঙ্গলের এই কাহিনির নবব্যাখ্যা পাই এ কবিতায়। বিষজর্জরিত লখিন্দরের দেহটিকে কবি কল্পনা করেন 'শতাব্দীর সাপে কাটা দেহ' হিসাবে। ত্রিপূর্ণি, ভীষণ ক্ষারজলের নদী। বেহুলা লখিন্দরকে নিয়ে এই নদীর জলেই ভেসে গিয়েছিল। এই নদীপ্রবাহ হল সময়ের প্রবাহ আর শতাব্দীর ঘুণেধরা ক্ষত বিক্ষত দেহ হল মৃত লখিন্দর। বিশ্বাসহীনতা, সন্দেহ, আশঙ্কা প্রভৃতি ক্ষয়ীভূত মূল্যবোধে লাঞ্ছিত শতাব্দী, মৃতদেহের মতো। বেহুলা শত বাধা এড়িয়েও তার মান্দাস ভাসায় জীবনের প্রত্যাশায়। কবি এই বিশ্বাসকেই 'জোয়ার' বলেছেন। দৃঢ় বিশ্বাস বা প্রত্যয়ের ফলেই বেহুলা জীবন আনে মৃতদেহে। আমাদের হারানো বিশ্বাস আর প্রত্যয় ফিরে পেলে আবার জেগে উঠবে শতাব্দী। মনের মধ্যেকার বিকার দূর হলেই নতুন প্রত্যাশার জন্ম হবে।

এইভাবে ভিন্ন কবির ভাষায় উদ্ভাসিত হয়েছে নারীভাষার বিচিত্র অভিমুখ।

৩.

কবিতার শব্দ প্রত্যেক কবির কাছে পৃথকভাবে আসে। কবিতা সিংহ নিজে আত্মসমালোচনা করেছেন নিজের শব্দপ্রয়োগের জন্য, তিনি বলেন–

"বন্ধুরা, শত্রুরা, ভাইসব !
আপনারা আমাকে কেউ দয়া করে নিহত করুন।
কারণ শব্দের সেই অক্ষর মন্দির আমি ম্লেচ্ছ করেছি।"[২১]

কবিতায় রূঢ় শব্দ প্রয়োগের জন্য তিনি ক্ষমাপ্রার্থী।
নবনীতা দেবসেনের কাছে শব্দ অভিমানী, তিনি বলেন -

"শব্দেরা দাঁড়িয়ে থাকে
ঠিক যেন আকাশের গায়ে

সূর্যাস্তের অসম্ভব বর্ণাঢ্য বিনয়
অসংলগ্ন, অধরা, একাকী -"[২২]

তাঁর কাছে কবিতার ভাষা 'স্বাগত দেবদূতে'র মতো, বেশি মনোযোগ চায়। কেতকী কুশারী ডাইসন বলছেন তাঁর কাছে নিজের লেখাগুলি মিশ্র অনুভূতির ফসল–

"..... ঐ দ্যাখো, মিশে যাচ্ছে
জলে জল, শব্দের সমুদ্রে
তোমার কথা, আমার কথা,
তোমার কবিতা, আমার কবিতা,
আমাদের ভালোবাসারা।"[২৩]

বিভিন্ন কবির ভাবনা মিশে গিয়ে তাঁর কবিতার ভাষা এক অনন্ত 'শব্দসমুদ্র' তৈরি করে। গীতা চট্টোপাধ্যায়ের কাছে এই ভাষা একদম ভিন্নভাবে আসে। তিনি বলেন–

"নরম নক্ষত্র নামে স্বর্গ থেকে আত্মার মতন
বইয়ের মলাট থেকে শব্দ রেশমি ঝালরে লুটোয়
জন্মশিরে টইটুম্বুর দশ-দশটা আলতাগোলা বাটি
কবিতা লেখার আগে শব্দ করে কবিকে চুম্বন।"[২৪]

অন্তর্লোক বিধৌত করে স্বর্গীয় বিশুদ্ধ আত্মার মতন তাঁর কাছে শব্দ আসে।

অর্থাৎ একটি বিষয় - কবিতার শব্দ, পৃথক চারজন কবির কাছে কিভাবে সেই শব্দ আসে ও ব্যবহৃত হয় সেকথা রইল। নারীভাষার মধ্যে নারীর নিজের কথা থাকলেও তা বহুমাত্রায় ব্যবহৃত হয় এবং সমৃদ্ধ এক ভাষা পরিসর নির্মাণ করে।

উপসংহার

১৯৭৫ সালে Hélène Cixous, 'Écriture féminine' (women's writing) এর কথা বলেছেন। ১৯৭৯ সালে Elaine Showalter 'Gynocriticism' (Study of Women's writing) এর কথা বলেছেন। এর অনেক আগেই বাংলা কবিতায় নারীর নিজস্ব ভাষাপথ রচনার পর্ব শুরু হয়েছিল। কারও ভাষার তীব্রতা বেশি, কারও ভাষার অন্তর্লীন সুরে বাজে রাগিণী, কেউ বা সরলভাষায় বুনে যান বিশ্বের জলছবি, কেউ বা প্রজ্ঞায় সম্পৃক্ত করেন তাঁর কবিতার ভাষাকে। আবার ভাবনার বহিঃপ্রকাশেও আছে বিচিত্র বিচ্ছুরণ। সব মিলিয়েই সমৃদ্ধ এই নারীভাষার ভাণ্ডার। নির্বাচিত চারজন কবির কবিতার মধ্য দিয়ে এই ভাষার অতিসংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেওয়া হল। একাধিক কবি অনালোচিত থাকল এখানে। এই পথটি সুবিস্তৃত হচ্ছে ক্রমাগত, যা আগামী দিনের আলোচ্য হতে পারে।

তথ্যসূত্র

১. Sukumar Sen, *Women's Dialect In Bengali, Calcutta University* 1928, JIJNASA Publishing Department, Calcutta - 700009, P. 1r

২. Robin Tolmach Lakoff, *Language And Woman's Place (Text and commentaries)*, Mary Bucholtz (Edited by), 2004, Oxford University Press, New York - 10016, P.39,40

৩. কবিতা সিংহ, 'না', *কবিতাসংগ্রহ ১*, সুমিতকুমার বড়ুয়া (সম্পাদনা), নভেম্বর ২০১৯, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩, পৃ. ৫১

৪. প্রাগুক্ত, 'সম্রাজ্ঞী', পৃ. ৬৫

৫. প্রাগুক্ত, 'জ্বলন্ত রমণী চলে যায়', পৃ. ৯৭

৬. প্রাগুক্ত, 'আমি ত কবেই চলে গেছি', পৃ. ৯৩

৭. প্রাগুক্ত, 'স্বয়ংক্রিয়', পৃ. ৮৫

৮. প্রাগুক্ত, 'এস্টাব্লিশমেন্ট', পৃ. ১২৬

৯. নবনীতা দেবসেন, 'পুষ্পিত প্রহার', *নবনীতা দেবসেনের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, ষষ্ঠ সংস্করণ - অগ্রহায়ণ ১৪২৬, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩, পৃ. ৪২

১০. প্রাগুক্ত, 'নাজমা', পৃ. ১৬৭

১১. প্রাগুক্ত, 'ধর্ষণরাত্রির স্মৃতি', পৃ. ১৭৭

১২. কেতকী কুশারী ডাইসন, 'পিছুটান', *কবিতাসমগ্র ১*, প্রথম সংস্করণ - সেপ্টেম্বর ২০১৫, সিগনেট প্রেস, কলকাতা - ০৯, পৃ. ৩

১৩. প্রাগুক্ত, 'নালন্দার পথে', পৃ. ১২৫

১৪. প্রাগুক্ত, 'ঘর', পৃ. ১১৩

১৫. প্রাগুক্ত, 'একটি খবর পড়ে', পৃ. ২৪৩

১৬. প্রাগুক্ত, 'ঈভের বিলাপ', পৃ. ২৭৬

১৭. গীতা চট্টোপাধ্যায়, *কবিতাসংগ্রহ*, জানুয়ারি ২০১৬, আদম, নদীয়া - ৭৪১১০১, পৃ. ভূর্জপত্র

১৮. প্রাগুক্ত, 'মনসার সর্পসজ্জা', পৃ. ১৫৭

১৯. প্রাগুক্ত, 'কর্তার ঘোড়া দেখে রাসসুন্দরী', পৃ. ১৬০

২০. প্রাগুক্ত, 'লিব্ আন্দোলনের বিপক্ষে ঈশ্বরের পদপ্রান্তে', পৃ. ৩১২

২১. কবিতা সিংহ, 'অসমাপ্ত কবিতা', *কবিতাসংগ্রহ ১*, সুমিতকুমার বড়ুয়া (সম্পাদনা), নভেম্বর ২০১৯, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩, পৃ. ৮১

২২. নবনীতা দেবসেন, 'হায় শব্দ', *নবনীতা দেবসেনের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, ষষ্ঠ সংস্করণ - অগ্রহায়ণ ১৪২৬, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩, পৃ. ৫১

২৩. কেতকী কুশারী ডাইসন, 'একেকসময়', *কবিতাসমগ্র ১*, প্রথম সংস্করণ - সেপ্টেম্বর ২০১৫, সিগনেট প্রেস, কলকাতা - ০৯, পৃ. ২১০

২৪. গীতা চট্টোপাধ্যায়, 'কবিকে তখন শব্দ', *কবিতাসংগ্রহ*, জানুয়ারি ২০১৬, আদম, নদীয়া - ৭৪১১০১, পৃ. ২০১